ISSN Print: 2394-7500
ISSN Online: 2394-5869
Impact Factor: 8.4
IJAR 2021; 7(11): 95-99
www.allresearchjournal.com
Received: 10-09-2021
Accepted: 13-10-2021

নীলেন্দু বিশ্বাস
সহকারী অধ্যাপক, আসাননগর মদন মোহন তর্কালঙ্কার কলেজ, নদীয়া, চলমান, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

জবা মণ্ডল
ছাত্র, স্নাতকোত্তর, নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Corresponding Author:
নীলেন্দু বিশ্বাস
সহকারী অধ্যাপক, আসাননগর মদন মোহন তর্কালঙ্কার কলেজ, নদীয়া, চলমান, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

বাপ্পা বোস: তারাশঙ্করের সার্থক "অভিনেত্রী"

নীলেন্দু বিশ্বাস ও জবা মণ্ডল

Abstract
সাম্প্রতিক উপন্যাস-সাহিত্য এবং ছোটগল্পে তারাশঙ্কর এক অনন্য প্রতিভা। তারাশঙ্করের উপন্যাসে মহাকাব্যিক ব্যাপ্তি আছে, আছে জীবন-জিজ্ঞাসার গভীরতা। বিংশ শতকের শিল্পী হয়েও তারাশঙ্কর ইতিহ্যানুসরণ থেকে বঞ্চিত হননি। আধুনিক হবার কোন বিশিষ্ট সাধনা বা কামনা তাঁর নেই। উচ্চকণ্ঠ স্বাতন্ত্র্যঘোষণা বা রুগ্ন মানসিকতা, শৌখিন মজদুরি কিংবা কারুসর্বস্বতা থেকে তিনি সর্বপ্রযত্নে নিজেকে মুক্ত রেখেছিলেন। তবু বর্তমান যুগের তরঙ্গসঙ্কুলতা তিনি উপলব্ধি না করে পারেননি। সমাজের ও জীবনের সর্বস্তরের ক্ষয়িষ্ণুতা তাঁর কাছে গভীর বেদনার বার্তা বহন করে এনেছে। বিশ্লেষণ অপেক্ষাও গোটা প্রাণবন্ত মানুষের সাহচার্যই তাঁর অধিক কাম্য। অবক্ষিত বর্তমান তাঁকে জীবনবিরোধী না করে জীবনসন্ধানী করে তুলেছে। রাঢ়ের রুক্ষভূমির স্পর্শ, শ্রমজীবী চরিত্রের ভাস্কর্যনিপুণ গঠন এবং সুতীব্র আত্মানুসন্ধান তাঁর উপন্যাসকে দুর্লভ শিল্পোৎকর্ষ দিয়েছে। তারাশঙ্করের জীবন-দৃষ্টির একপ্রান্তে জমিদারী-প্রথা, তার পূর্ব গৌরবের স্মৃতি এবং বর্তমান ক্ষয়িষ্ণুতার বেদনা নিয়ে উপস্থিত, অন্যদিকে যন্ত্রসভ্যতার অপরিহার্য আগমন সম্পর্কেও লেখক অচেতন নন।
১৯৭০ সালে রচিত "অভিনেত্রী" তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমাজের ও জীবনের সর্বস্তরের ক্ষয়িষ্ণুতার চিত্রই ফুটিয়ে তুলেছেন। গল্প নয়, উপন্যাস হিসাবেই "অভিনেত্রী"-র পরিচয়। সমগ্র উপন্যাসটি মূলত একটি চরিত্রকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছে—বাপ্পা বোস। লেখক নিজের মুখ দিয়েই বাপ্পা বোসের অভিনয় জীবনের কাহিনী বিবৃত করেছেন এবং তাঁকে কেন্দ্র করে অন্যান্য চরিত্রগুলিও ফুটে উঠেছে। বাপ্পা বোস একজন বিখ্যাত অভিনেতা নানা অপেরায় ও যাত্রাপালায় অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে তিনি অভিনয় করেছেন। লাভপুরের ছোট ট্রেন লাইনের স্টেশন মাস্টারের ছেলে ইন্দুভুষণ বা ইন্দুরাণী যাত্রাদলে অভিনয়ের সৌজন্যে "বাপ্পা বোস" নামে বিখ্যাত হয়ে উঠেছেন। বাপ্পা বোস পুরুষ নয়, অভিনয় করেছেন নারী চরিত্রে। বাপ্পা বোসের সঙ্গে সাহিত্যিকের প্রথম আলাপ রবীন্দ্র সদনে "বিদ্যাসাগর" পালায় এক বিধবা মেয়ের চরিত্রে অভিনয়ের সূত্রে। ২২-২৩ বছরের বিধবা মেয়ের চরিত্রে বাপ্পা বোস এতই নিখুঁত অভিনয় করেছিলেন যে সাহিত্যিক মহাশয় ধরতেই পারেননি-- "কণ্ঠস্বরে পর্যন্ত পুরুষ সত্তার কোন আভাস মেলে না "।
বাপ্পা বোসের মুখ দিয়ে সমগ্র কাহিনী পাঠকের সামনে উপস্থাপন করলেও স্বয়ং লেখক তারাশঙ্কর নিজেই যে নাটকে অভিনয় করেছেন, এমনকি নারী চরিত্রে, সে কথাও জানা যায়। আসল কথা শুধু নাটক লেখা নয়, নাটকে অভিনয়ের ক্ষেত্রেও তাঁর উৎসাহ ছিল অসীম। তৎকালে পুরুষ শিল্পীরা মহিলা চরিত্রে অভিনয় করতেন, এটা খুব আশ্চর্যের ছিল না। বাপ্পা বোসের সৌজন্যে আরও কতকগুলি চরিত্র মূর্ত হয়ে উঠেছে—সুরঞ্জন চৌধুরী, ভারত ঘোষাল, কেষ্টবিনোদ, বিনি ওরফে মায়ারাণী। কিন্তু একজন সার্থক অভিনেত্রী হিসাবে ইন্দুভূষণ ওরফে বাপ্পা বোসই সকলকে টেক্কা দিয়ে বেরিয়ে যান।

Keywords: তারাশঙ্কর-বাপ্পা বোস-থিয়েটার-অভিনয়-নারীর পার্ট-মায়ারাণী

Introduction
বাংলা ছোট গল্পের জগতে শরৎ-পরবর্তী প্রতিনিধিস্থানীয় বিশেষ নামের মধ্যে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৯৮-১৯৭১) কথা সন্দেহাতীতভাবে উচ্চারণীয়। কল্লোল-পর্বের তরুণ লেখক সাহিত্যিকদের লেখনিতে সংশয় ও অস্থিরতা, চাঞ্চল্য ও নাগরিক মনোভাব, নেতিবাদী ও নাস্তিক দৃষ্টিভঙ্গি, রোমান্টিক বিদ্রোহ ও দেশজ সংস্কৃতির অস্বীকৃতিমূলক মনোভাব প্রাধান্য পেয়েছিল। এরই প্রতিক্রিয়ায় ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে দেখা দিয়েছিলেন ছোটগল্পকার তারাশঙ্কর।

কল্লোল-যুগের বিশিষ্ট লেখকগোষ্ঠীর—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, বুদ্ধদেব বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রমুখের মানসিকতা ও সাহিত্যজীবন সম্পর্কে সংশয়, বিশ্বাসহীনতা মেনে নেননি। কল্লোলের লেখকদের সঙ্গে তারাশঙ্করের একটা প্রধান অমিল এইখানে যে কল্লোলের বুদ্ধিজীবী শিক্ষিত তরুণেরা পাশ্চাত্য সাহিত্য ও জীবনভাবনা থেকে প্রেরণা পেয়েছিলেন। তারাশঙ্কর রাঢ়ের গ্রামজীবন থেকেই উঠে এসেছিলেন।

সেটাই ছিল তাঁর সাহিত্যচর্চার প্রেরণাভূমি। তারাশঙ্কর নেতিবাদী নন, আপন স্বাতন্ত্র্যে মানবজীবন নিয়ে করেছেন নানা রকমের পরীক্ষা। এই পরীক্ষায় মানুষের ওপর তাঁর বিশ্বাস বড় হয়ে উঠেছে, বড় হয়েছে মানবপ্রেম। তাই দেখা যায় জীবনের ও জীবনপ্রেমের মূলীভূত রহস্যকে বুঝতে গিয়ে তিনি সভ্য-ভদ্রজীবন ও তার মানুষগুলিকে আধার হিসাবে সর্বত্র গ্রহণ করেননি, নেমে এসেছেন একেবারে অশিক্ষিত অমার্জিত, আদিম জৈব কামনা-বাসনায় ভরপুর জীবন-পরিবেশে, তার সত্যে লালিত মানব-মানবীদের ভিরে।

তারাশঙ্করের সাহিত্য চেতনা প্রসঙ্গে নিতাই বসু "তারাশঙ্করের শিল্পিমানস" গ্রন্থে তারাশঙ্করের মানব হৃদয়ের বিশ্লেষণের অদ্ভূত প্রতিভার কথা তুলে ধরেছেন। তাঁর মতে, জীব হিসাবে মানুষের হৃদয়ে কতগুলি যে মৌল প্রবৃত্তি আছে, যেগুলি মানব হৃদয়ের নিত্যকালের সঙ্গী, এই প্রবৃত্তিগুলির রহস্যময় রূপের সঙ্গে তারাশঙ্কর পরিচিত হতে চেয়েছেন। এই প্রচণ্ড জীবন-পিপাসাকে কবি মোহিতলাল বলেছেন "তান্ত্রিক রস-দৃষ্টি"। মানুষের জৈবরূপের আদিমতম উৎসমুখে প্রবেশের জন্য তারাশঙ্কর বেপরোয়া অভিযাত্রীর মতো অগ্রসর হয়েছেন, যার অন্যতম প্রমাণ তাঁর "অভিনেত্রী"।

যদিও তারাশঙ্করের সাহিত্য চেতনায় মানুষের বহু বিচিত্র জীবনের আশ্চর্য-সুন্দর অভিজ্ঞতার স্বাদ পরিবেশনের ক্ষেত্রে শিল্পে সুষমামণ্ডিত উপস্থাপন রীতির দিকে নজর আবশ্যিকতা পালনে ব্যর্থ হয়েছেন বলে মনে হয়। যে কারণে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলতে বাধ্য হয়েছেন, "তিনি ততটা আর্টিস্ট নহেন, যতটা জীবন রসের রসিক"। একইভাবে কাজী আব্দুল ওদুদ মন্তব্য করেছেন, "তারাশঙ্করের হৃদয়টি বিশাল, কিন্তু তাঁর দৃষ্টি সে তুলনায় কম পরিচ্ছন্ন"। অবশ্য সামগ্রিকভাবে এধরনের অভিমত গ্রহণীয় নয়, কারণ তাঁর বিচিত্র অভিজ্ঞতা, বিশেষত স্থানিক সংস্কৃতির প্রতি লুব্ধ পুঙ্খানুপুঙ্খ জ্ঞানকে পরিশীলিত ও পরিমার্জিত করে তিনি বহু প্রথম শ্রেণীর গল্প রচনায় হাত দিয়েছেন।

সাম্প্রতিক উপন্যাস-সাহিত্য এবং ছোটগল্পে তারাশঙ্কর এক অনন্য প্রতিভা। তারাশঙ্করের উপন্যাসে মহাকাব্যিক ব্যাপ্তি আছে, আছে জীবন-জিজ্ঞাসার গভীরতা। বিংশ শতকের শিল্পী হয়েও তারাশঙ্কর ইতিহ্যানুসরণ থেকে বঞ্চিত হননি। আধুনিক হবার কোন বিশিষ্ট সাধনা বা কামনা তাঁর নেই। উচ্চকণ্ঠ স্বাতন্ত্র্যঘোষণা বা রুগ্ন মানসিকতা, শৌখিন মজদুরি কিংবা কারুসর্বস্বতা থেকে তিনি সর্বপ্রযত্নে নিজেকে মুক্ত রেখেছিলেন। তবু বর্তমান যুগের তরঙ্গসঙ্কুলতা তিনি উপলব্ধি না করে পারেননি। সমাজের ও জীবনের সর্বস্তরের ক্ষয়িষ্ণুতা তাঁর কাছে গভীর বেদনার বার্তা বহন করে এনেছে। বিশ্লেষণ অপেক্ষাও গোটা প্রাণবন্ত মানুষের সাহচার্যই তাঁর অধিক কাম্য। অবক্ষিত বর্তমান তাঁকে জীবনবিরোধী না করে জীবনসন্ধানী করে তুলেছে। রাঢ়ের রুক্ষভূমির স্পর্শ, শ্রমজীবী চরিত্রের ভাস্কর্যনিপুণ গঠন এবং সুতীব্র আত্মানুসন্ধান তাঁর উপন্যাসকে দুর্লভ শিল্পোৎকর্ষ দিয়েছে। তারাশঙ্করের জীবন-দৃষ্টির একপ্রান্তে জমিদারী-প্রথা, তার পূর্ব গৌরবের স্মৃতি এবং বর্তমান ক্ষয়িষ্ণুতার বেদনা নিয়ে উপস্থিত, অন্যদিকে যন্ত্রসভ্যতার অপরিহার্য আগমন সম্পর্কেও লেখক অচেতন নন।

১৯৭০ সালে রচিত "অভিনেত্রী" তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমাজের ও জীবনের সর্বস্তরের ক্ষয়িষ্ণুতার চিত্রই ফুটিয়ে তুলেছেন। গল্প নয়, উপন্যাস হিসাবেই "অভিনেত্রী"-র পরিচয়। সমগ্র উপন্যাসটি মূলত একটি চরিত্রকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছে—বাপ্পা বোস। লেখক নিজের মুখ দিয়েই বাপ্পা বোসের অভিনয় জীবনের কাহিনী বিবৃত করেছেন এবং তাঁকে কেন্দ্র করে অন্যান্য চরিত্রগুলিও ফুটে উঠেছে। মূল কাহিনী শুরু হয়েছে বাপ্পা বোসের কথা দিয়েই—"এই বিচিত্র কাহিনী শুনীয়ে গেল আমাকে বাপ্পা বোস।....."

বাপ্পা বোস একজন বিখ্যাত অভিনেতা নানা অপেরায় ও যাত্রাপালায় অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে তিনি অভিনয় করেছেন। লাভপুরের ছোট ট্রেন লাইনের স্টেশন মাস্টারের ছেলে ইন্দুভুষণ বা ইন্দুরাণী যাত্রাদলে অভিনয়ের সৌজন্যে "বাপ্পা বোস" নামে বিখ্যাত হয়ে উঠেছেন। তাঁর নিজের পরিচয় প্রসঙ্গে বাপ্পা বোস বলেছেন, "লাভপুর আমার বাড়ি, সিউড়ী জেলার হেডকোয়ার্টার। মধ্যে আমদপুর রেলওয়ে জংশনও বটে আবার বড় ব্যবসার জায়গাও বটে ; দশ-বারোটা তেলকল আছে একটি কোম্পানির—বড় বড় মহাজনী গদি আছে ; কিন্তু এসব থেকেও আমদপুরের বেশী নাম উঠে যাওয়া চিনি কলের জন্য....."। যদিও বাপ্পা বোস পুরুষ নয়, অভিনয় করেছেন নারী চরিত্রে। বাপ্পা বোসের সঙ্গে সাহিত্যিকের প্রথম আলাপ রবীন্দ্র সদনে "বিদ্যাসাগর" পালায় এক বিধবা মেয়ের চরিত্রে অভিনয়ের সূত্রে। ২২-২৩ বছরের বিধবা মেয়ের চরিত্রে বাপ্পা বোস এতই নিখুঁত অভিনয় করেছিলেন যে সাহিত্যিক মহাশয় ধরতেই পারেননি-- "কণ্ঠস্বরে পর্যন্ত পুরুষ সত্তার কোন আভাস মেলে না "।

বাপ্পা বোসের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের পর কাজের চাপে গল্পকার তাঁর কথা ভুলেই গিয়েছেন। কয়েক বছর পর একবার গ্রামের বাড়িতে গিয়ে আকস্মিকভাবেই বাপ্পা বোসের সঙ্গে দ্বিতীয়বার সাক্ষাত হয়ে যায়। আমদপুরে একটা একজিবিশন উপলক্ষে বিখ্যাত যাত্রাদল এসেছে। আমদপুর কর্তৃপক্ষ তারাশঙ্করকে যাত্রা দেখার নিমন্ত্রণ করলেও তিনি যাননি। অথচ পরেরদিন গ্রামের কয়েকজন উৎসাহী যুবক তাদের অখ্যাত গ্রামে যাত্রাদলকে আমদপুর থেকে ফেরার পথে এক রাত্রী যাত্রা গাওনা করার জন্য একটি চিঠি লিখে দেবার জন্য গল্পকারের নিকট উপস্থিত হয়। চিঠি লিখে দেবার পরপরই সেখানে উপস্থিত হয় "সুন্দর সুবেশ একটি তরুণ"—বাপ্পা বোস।

প্রথমে চিনতে না পারলেও উপস্থিত স্থানীয়দের ফিসফাস কথায় তারাশঙ্কর চিনতে পরলেন বাপ্পা বোসকে। বেশ কিছুটা সময় নিয়েই যে বাপ্পা বোস এসেছিলেন তা বোঝা যায় বাগানের বাঁধানো বেদীতে বসতে দেখে। ভাব জমানোর জন্য বাপ্পা বোস গল্পকারের প্রথম জীবনের কথা, বিশেষ করে লাভপুরের থিয়েটারে তারাশঙ্করের নারীভূমিকায় অভিনয় করার কথা বললে লেখক অবাক হন। এমনকি বাপ্পা বোস নিজেও তারাশঙ্কর অভিনিত "কর্ণার্জুনে" নিয়তির পার্ট এবং "মাটির ঘরে" ছোট মেয়ের পার্ট করেছিলেন। নিমেষে তারাশঙ্করের মনে পড়ে যায়—"সোনার বালা পরা হাত। গায়ে গেরুয়া রঙের পাঞ্জাবি, পরনে একখানা

মেয়েছেলের চওড়া পাড় শাড়ি । হাতে মুখে পেন্ট, চোখে কাজল, কপালে কুমকুমের টিপ.....মুখ দেখে মনোহারিণী একজন তরুণী বলেই মনে হয়েছিল।"

পার্ট সে দারুন করেছিল। যেমন নিয়তি তেমনি ওই মাটির ঘরের পার্ট। যদিও বাপ্পা বোসের সেদিন ভালো লেগেছিল মাটির ঘরে তারাশঙ্করের বড় জামাই-এর পার্ট । ১৯৪১ সালে ঘটে যাওয়ার সেদিনের থিয়েটার জীবনের কথা বাপ্পা বোস নতুন করে মনে করিয়ে দিয়েছেন । ১৯৬৮ সালের সাম্প্রতিক কালে তারাশঙ্কর সে সব কথা ভুলেই গেছেন। দীর্ঘ স্রোতপ্রবাহে ইন্দুভূষণের মতো একটি ছেলের কোথায় কোন দিগন্তরে ভেসে লাগার কথা ; কিন্তু বাপ্পা বোস এতদিন পর কথাটা মনে করিয়ে দেয় । বলাবাহুল্য, বাপ্পা বোস ও তাঁর দলবল অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গেই পাকা স্টেজ থাকা অডিটোরিয়ামে অভিনয় করেছিলেন। এই গ্রামে এতই সমাদর পেয়েছিলেন যে তারাশঙ্করকে কৃতজ্ঞতা জানাতে গিয়ে সেখানেই থাকার আবদার জানিয়ে ছিলেন। সেই আবদার অবশ্য মঞ্জুর হয়েছিল। কথা সূত্রেই বাপ্পা বোসকে তিনি জিজ্ঞেস করেছিলেন যে বিরহে গোলাপীর পার্ট করেছে কিনা । উত্তরে বাপ্পা বোস জানিয়ে ছিলেন, গোলাপীর পার্টটাই তাঁর জীবনের প্রথম পার্ট । কিন্তু ইন্দুভূষণ বোস কি করে বাপ্পা বোস হলেন তার উত্তরে জানায়, ঐতিহাসিক "বাপ্পা রাও" নাটক অভিনয় করে এতই জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলেন যে লোকের মুখে মুখে ইন্দুভূষণের নাম পরিবর্তীত হয়ে "বাপ্পা বোস" ছড়িয়ে পড়ে।

আলোচনার মধ্যে দিয়েই বৈকুণ্ঠপুর গ্রামের কথা ওঠে, যেখানে বাপ্পা বোস একটা সময় অতিবাহিত করেছেন । বৈকুণ্ঠপুরের চৌধুরীবাবুদের সঙ্গে আলাপের সূত্রে সেখানেই বড়বাবু সুরঞ্জন চৌধুরী বাপ্পা বোসকে ভারতবাবুর বাড়িতে চাকরির ব্যবস্থা করে দেন৷ সেদিন ভারতবাবুকে (ভারতচন্দ্র ঘোষাল) দেখে বাপ্পা বোস অবাক হয়ে গেছিল, "কাঁচাপাকা চুল, লালচে গৌর গায়ের রঙ, ছোটখাট রোগা মানুষ। একখানা পা হাঁটুর নীচে থেকে কাটা.....।" তিনি অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে বলেছিলেন -- "আচ্ছা, তুমিই ইন্দুভূষণ? আমি স্বদেশের দাদা । " এই ভারতবাবুর বাড়িতেই বাপ্পা বোসের আলাপ হয়েছিল সম্পূর্ণ নতুন একটি পরিবারের সঙ্গে, যার গল্প বাপ্পা বোসই আমাদের শুনিয়েছেন। এখানেই বাপ্পা বোস ভারতবাবুর বোনের কথা জেনেছেন । বিনি বা বিনোদিনীর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের প্রসঙ্গে বাপ্পা বলেছেন --"এই ছবিটা আমার জীবনে অক্ষয় হয়ে রয়ে গেছে। ওই লাল রঙের জমি কষকষে নীলাভ কালাপাড় শাড়ি পরা একটি মেয়ে, কাঁখে কলসী, সিঁথিতে সিঁদুর, পরিপূর্ণা যৌবনা, একটু দীর্ঘাঙ্গী, পিঠে এক রাশি চুল।"

ইন্দুভূষণ তথা বাপ্পা বোসের কথাতেই ভারতবাবুর পরিবারের কথা বিস্তারিত জানা যায় । ভারতবাবু ও স্বদেশবাবু দুই ভাই, তাঁদের ঠিক মাঝেই বোন বিনোদিনীর অবস্থান । তাঁদের পিতা ছিলেন গরিব স্কুল মাস্টার, কিন্তু অতিমাত্রায় স্বদেশী । দেশের প্রতি ভালোবাসার টানেই তিনি ছেলেমেয়েদের নাম রেখেছেন । মেয়ে বিনোদিনীকে বিয়ে দিয়েছেন বৈকুণ্ঠপুরের থিয়েটারপ্রেমী গোপেনের সঙ্গে । লম্বা দশাসই চেহারা, গোলগোল চোখ, কর্কশ কণ্ঠস্বর ও দুর্দান্ত চেহারার গোপেন ভিলেনের পার্ট করত, যার জন্য বিনি কাঁদত৷ তবে অভিনয় করলেও গোপেন বর্ধমানে চাকরি করত । কিন্তু এই চাকরির সূত্রেই গোপেন বর্ধমানের মহাজনটুলীর এক বারবনিতার পাল্লায় পড়ে শেষ হয়ে যায়। দুই বিধবা মহিলার ব্যাংকে রাখা টাকা চেক জাল করে গোপেন তুলে নেয়। পরে বিষয়টি জানাজানি হতে গোপনকে পুলিশে ধরে, বিনির কপাল পোড়ে, ঘোষাল মাস্টারও সেটা সহ্য করতে না পেরে প্রাণ হারান।

গল্প বয়ে চলে তার আপন বেগে। ভারত ঘোষালের জীবনের মোর ঘুরিয়ে দেয় এই আকস্মিক ট্রাজেডি। বোনের ভাগ্য বিপর্যয়, পিতার মৃত্যু তাকে স্বাভাবিকভাবেই বৈকুণ্ঠপুরে টেনে আনে। সেখানেই বড় বাবুর সৌজন্যে স্কুলে চাকরি পেলেন ভারত ঘোষাল । তিনি ভালো গান গাইতে পারতেন, তাঁর গান শুনেই বড় বাবু মুগ্ধ হয়ে চাকরি দিয়েছিলেন। এই চাকরি যদিও টেকেনি। মাস্টারির পাশাপাশি ভারতবাবু বড় বাবুর চাপে পড়ে থিয়েটারে গান গাইতেন, স্বদেশী গান। মাস্টারি গেলেও বড় বাবু তাঁর নিজের অফিসেই হেডক্লার্কের চাকরি দিলেন।

বড় বাবু সুরঞ্জন চৌধুরী নিজেই লিখেছেন "বিজয়িনী" নাটক এবং নাটকটি মঞ্চস্থ করবেন বলে স্থির করেছেন । শেষে রায়বাহাদুরের সৌজন্যে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের নাটক "বিরহ" প্রথম দিন এবং বড়বাবুর "বিজয়িনী" দ্বিতীয় দিন থিয়েটারে মঞ্চস্থ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কিন্তু ফিমেল পার্ট করার জন্য কলকাতার এমেচার থিয়েটারে ফিমেল পার্ট খ্যাত সিধুবাবু হঠাৎ পলায়ন করলে সকলের মাথায় বাজ পড়ে। এই আসন্ন বিপদ থেকে তাঁদের উদ্ধার করলেন ভারত বাবু। তিনি ফিমেল পার্ট ও মেয়েলি গলায় গান করে দেবেন জানান, কিন্তু নাচ করতে পারবেন না। শেষে বড়বাবুর চেষ্টায় ভারতবাবুর নাচ শেখা এবং তা থিয়েটারে উপস্থাপন করা সম্ভব হয় । কিন্তু মঞ্চে নাচ করার সময় একটা পেরেক ভারতবাবুর পায়ে ফুটেছিল। প্রথমে আমল না দিলেও ব্যাণ্ডেজ বেঁধে আবার নাচ করেছেন, শিখেছেনও । কিন্তু তাঁর পা পরে এতটাই বিষাক্ত হয়ে ওঠে যে ভারতবাবুকে শুধু প্রাণ বাঁচাতেই ওই পা কেটে

বাদ দিতে হয় । বড়বাবু এরপরেও ভারতবাবুকে তাঁর থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত রাখার চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছেন।

ভারতবাবুর কথা ছাড়াও বাপ্পা বোসের মুখ দিয়ে আরও একটি চরিত্র মূর্ত হয়ে ফুটে উঠেছে--কেষ্টবিনোদ । এই কেষ্টবিনোদই বৈকুণ্ঠপুর থেকে ভেসে আসা বাপ্পা বোসকে মথুর শা-র যাত্রার দলে আশ্রয় দিয়েছিলেন। কৃষ্ণবিনোদ, যিনি কেষ্টবিনোদ নামেই বেশি পরিচিত ছিলেন । কেষ্টবিনোদ ছিলেন সেকালের যাত্রা দলের অর্জুন। লোকটা এমনি ভালো হলেও তাঁর দোষও কম ছিল না। বাপ্পা বোসের কথায় বলা যায়, "একটা দোষ ছিল --মার হাতের দোষ। হঠাৎ মারতে আরম্ভ করত। দেহে শক্তি ছিল ; ডন বৈঠকীও করত। তবে মদ খেতো তো " । আবার যাত্রা দলে মেয়েদের অভিনয় করার ব্যাপারে তিনি ঘোরতর বিরোধী ছিলেন । কেষ্টবিনোদ এক সময় বলেছিলেন, "মেয়েরা পার্ট করতেই পারে না। ওদের যা কিছু পার্ট তা সাধারণ জীবন। সবই ওদের পার্ট। ভাইফোঁটা দেয় তাও পার্ট করে, ফুলসয্যায় আসে সেও পার্ট করে.....।" কিন্তু এই কেষ্টবিনোদবাবুই মথুর শা-র গণেশ অপেরায় "বাপ্পারাও" নাটকটি এনেছিলেন। নাটকে ছোট বাপ্পার চরিত্রে ইন্দুভূষণকে পার্ট দিয়েছিলেন। যাত্রায় ইন্দুভূষণের সাফল্য দেখে উচ্ছসিত হয়ে খোদ কেষ্টবিনোদই "বাপ্পা রাও." পরে "বাপ্পা বোস" নাম দিয়েছিলেন । সেই থেকেই "ইন্দুভূষণ" হয়ে গেলেন "বাপ্পা বোস"।

বাপ্পা বোস নামকরণ করলেও কেষ্টবিনোদ মেয়ে চরিত্রের বাইরে পুরুষ চরিত্রে বাপ্পাকে অভিনয় করতে নিষেধ করেন । কেষ্টবিনোদ বলতেন,

"তুই শালা একচল্লিশ বছরে যে দিন পা দিবি পটাসিয়াম সাইনাইড খেয়ে খতম করে দিবি নিজেকে। তোর আর মেয়ে সাজবার বয়স থাকবে না। তোকে আর কেউ নেবে না।" আসল কথা, বাপ্পা বোসের কাছে অভিনয়ে হেরে গিয়ে কেষ্টবিনোদ ক্ষেপে গিয়েছেন। তাই স্টেজ থেকে গ্রিনরুমে ফিরে এসে সটান চড় কষিয়ে ছিলেন বাপ্পার গালে । অথচ এই কেষ্টবিনোদই বাপ্পা বোসকে খুব স্নেহ করতেন, তাঁকে ভালো থাকার পরামর্শ দিতেন- "মদ সিগারেট খাস নে। মেয়ে সাজবার চেহারা নষ্ট হবে, গানের গলা যাবে । মেয়েদের পার্টেই তোর একসেলেন্স । মেয়েদের পার্ট ছাড়া পুরুষের পার্টে কদাচ নামিস নে। মেয়ে দলে যাস নে ।..... আর এই একশোটা টাকা তুই নে, পোস্টাপিসে একটা একাউন্ট পত্তন করিস। তাতে কিছু কিছু জমিয়ে রাখিস। এটা তোকে চড় মারার দাম আমি দিচ্ছি না।...." মথুর শা-র গণেশ অপেরা থেকে কেষ্টবিনোদ নিজেকে সরিয়ে নিয়েছিলেন বাপ্পা বোসের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় হেরে গিয়ে। "কেষ্টবিনোদ কখনও পার্ট করতে গিয়ে হারে নি, তোর কাছে হারলাম।"

যে কেষ্টবিনোদ একসময় বাপ্পাকে বলেছিলেন যে পুরুষ চরিত্রে বাপ্পাকে মানাবে না, সেই কেষ্টবিনোদই গণেশ অপেরা ছেড়ে যাওয়ার ঠিক আট বছর পরেই বাপ্পাকে দিয়ে পুরুষের পার্ট করিয়ে ছিলেন । এই আট বছরের মধ্যে এ দল ও দল সে দলে বাঘের মতো ঘুরতে ঘুরতে অবশেষে মোহিনী অপেরাতে এসেছে ফাঁদে পড়ে গেছে। এই মোহিনী অপেরার মালিক ছিলেন মায়ারাণী বা মায়াবিনী । এই মায়ারাণীরকে বাজারে বলা হতো "রাক্ষসী মায়া"। আকস্মিক ভাবেই একদিন খোলার চাল পাড়ার একটি দেহ কেনাবেচার বাজারে মায়ারাণীর আবির্ভাব ঘটেছিল । সেখানে পা দিয়েই সে জয় করেছিল সারা বাজার । কেষ্টবিনোদের মতো খদ্দেরদের খপ্পরে পড়তেও দেরি হয়নি। জনৈক এক বাবুর মারফৎ মায়ারাণীর সঙ্গে কেষ্টবিনোদের সাক্ষাৎ হয়েছিল । সেই বাবুটি অবশ্য মায়ার খপ্পর থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছিলেন, তাই কেষ্টবিনোদের হাতে ছেড়ে দিয়ে নিজে সরে পড়লেন । তাঁর আগে একটা থিয়েটার স্থাপন করে যান মায়ারাণীর অধীনে।

এই মায়ারাণী চরিত্রকে তারাশঙ্কর এমনভাবে উপস্থাপন করেছেন যে যাত্রা জগতের সুনিপুন অভিনেতা (অভিনেত্রী) বাপ্পা বোস পর্যন্ত ঘোল খেয়ে গিয়েছেন । কিন্তু কেষ্টবিনোদের অভিনয় জীবন শেষের দিকে এতটা খারাপ হয়ে উঠেছিল যে তিনি খোদ বাপ্পা বোসের স্মরণ নিতে বাধ্য হন। ঝরিয়ার যাত্রার আসর সে সময়ে খুবই প্রষিদ্ধ ছিল, রাজাদের অঢেল পয়সা। সেখানেই দুদিন ধরে মায়াবতী অপেরার পর পর দুই দিন গাওনা গেলেও তৃতীয় গাওনার দিন বিভ্রাট দেখা দেয়। অভিনয় ও পোশাক খারাপ হওয়ায় কত্যুক্তির জেরে অনেক শিল্পী দল ছেড়ে পলায়ন করেন। তাই মান ও প্রাণ বাঁচাতে কেষ্টবিনোদ ছুটে এসেছেন মডার্ন অপেরার ম্যানেজারের কাছে। সেখানেই বাপ্পা বোসের সঙ্গে তাঁর দেখা। এযাত্রায় বাপ্পা বোস তাঁকে উদ্ধার করে দেন এবং আট বছর পূর্বের চড় মারার অদৃশ্য শোধ তোলেন।

গল্পের শেষের দিকে তারাশঙ্কর এমন নাটকীয় ভাবে বাপ্পা বোসের কাহিনী অবতারণা করেছেন, যা কেবল পাঠককেই নয় তারাশঙ্কর নিজেই ঘোল খেয়ে গেছেন । ভারত ঘোষাল বা ভারতবাবুর একমাত্র বোন বিনি বা বিনোদিনী চরিত্রটি প্রথম থেকেই গোলমেলে ছিল বলে বাপ্পা বোসের মনে হয়েছিল । প্রথম সাক্ষাতে ইন্দুভূষণ বিনিকে সদ্যস্নাত অবস্থায় দেখে মোহিত হয়ে যায়। বিনি বিবাহিত হলেও সে যে সুখী ছিল না তা কারও অবিদিত ছিল না। বিনি বাপ্পা বোসের চেয়ে বয়সে বড় ছিল, তাই এক প্রকার ভয় জড়িয়ে ছিল বাপ্পা বোসের দেহমনে। সে খুব একটা কথা বলত না বিনির সঙ্গে। বিনির স্বামী গোপেন টাকা চুরির অপরাধে জেলে গেলে বিনি যথেষ্ট শক খেয়ে ছিল। তাঁর নিকট জীবন অসহ্য হয়ে উঠেছিল। আনমনে বিনি ভালোবেসে ছিল বাপ্পা বোসকে, কিন্তু বলতে পারে নি। পরে একদিন যাত্রার শেষে ভারতবাবু বাপ্পা বোসকে একাই বাড়ি ফিরে যাওয়ার কথা বলেন। এই ঘটনা বাপ্পা বোসের জীবনে পশ্চিমী ঝঞ্ঝা বয়ে আনে। রাতে বাপ্পা বোস ভারতবাবুর বাড়িতে ফিরে নিজের কক্ষে বিনিকে গোলাপীর সাজে কাঁখে কলসী নিয়ে, বাপ্পা বোস যে ভাবে গোলাপী সেজে অভিনয় করতেন, সেই একই ভঙ্গিমায় হেসে গান করতে দেখে --"হেসে নাও দু দিন বই তো নয় " । এক লহমায় ইন্দুভূষণ তথা বাপ্পা বোস বুঝে নিলেন, বিনি তাকেই ভালোবাসে। ভয়ে পালিয়ে এসেছিল সেই রাতেই বৈকুণ্ঠপুর থেকে।

ভুলে যেতে চেয়েছিল বাপ্পা বোস, হ্যাঁ সে বিনিকে ভুলেই যেতে চেয়ে যাত্রা জগতেই নিজেকে আরও বেশি করে জড়িয়ে ফেলে । কেষ্টবিনোদের সংস্পর্শে নতুন জীবন শুরু করে। কিন্তু সে কি পেরেছিল বিনিকে ভুলে যেতে? না পারে নি। এক অব্যক্ত যন্ত্রনায় বারে বারেই ছট ফট করেছে । এই কেষ্টবিনোদের সৌজন্যেই বাপ্পার দেখা হয়ে যায় মায়াবিনী বা মায়াবতীর সঙ্গে। প্রথম দেখাতেই বাপ্পা বোস মায়ারাণীর মধ্যে বিনিকে খুঁজে পায়। যদিও বিনিকে মায়ারাণীর সঙ্গে মেলাতে পারে না। কিন্তু বারে বারেই তাঁর মনে হয়েছে, "চেনা। বড্ড চেনা।.....এ কে? এ কে? এ কে?" । অথচ রতির পার্টে সেজে থাকা মায়া উত্তর দিয়েছে, "তবে আপনাকে তো আমি চিনি।.....আপনার সামনে দাঁড়াতে পারব তো?" রতির পার্ট বাপ্পা বোস আগে করেছে, তাই সে সবটাই জানে। কিন্তু কেন জানি না কেষ্টবিনোদের খুব সন্দেহ হচ্ছে যে রতির পার্টে থাকা মায়া হয়তো বাপ্পাকে নিজের কাছে টেনে আনতে পারে। তাই তো কেষ্টবিনোদ সতর্ক করে বাপ্পাকে, "ওই জায়গাটায় সাবধান হোস বাপ্পা। ওখানটা মাগী খুব ভালো করে রে। কাঁদে, ব্যাকুল দৃষ্টিতে তাকায়, মিনতি করে।..."

কিন্তু না, সে ভুল মায়া করে নি। যদিও প্রদুম্ন বেশে থাকা বাপ্পাকে কাছে পেয়ে রতি নিজেকে হারিয়ে ফেলে, "যেন প্রিয় মনোহরণে তাঁর সর্ববিধ আয়ুধে সজ্জিত হয়ে সে একটির পর একটি প্রয়োগ করছে।.....কাঁখে কলসী নিয়ে অল্প হেলে দাঁড়িয়ে, হঠাৎ দেহখানায় সে হিল্লোল জাগিয়ে তুলল।" চিনতে পারে বাপ্পা বোস। মায়াও আগের বিনিরূপেই বাপ্পার নিকট নিজেকে ধরা দেয়, "যদি দেখা না কর -- তবে সেবার মরিনি, এবার মরব।" মরতে অবশ্য বিনি গিয়েছিল, কিন্তু পেয়ারা মাস্টার বিনিকে উদ্ধার করে নতুন জীবন দেয়। পরে সেখান থেকেই বিনি মায়ারানী নামে কেষ্টবিনোদের হাতে পরে। খুলে বসে মায়াবতী অপেরা, প্রথমে যথেষ্ট সুনাম জাগালেও শেষ রক্ষা করতে পারেনি। একদিকে মায়াকে পাওয়ার তীব্র আকুতি অন্যদিকে মায়ার বাপ্পাকে ফিরে পাওয়ার নিরন্তর কামনা এমন দ্বন্দ সৃষ্টি করে যে মায়াবতী অপেরা মুখ থুবড়ে পড়ে। বাপ্পা বোসের কথায়--"আট বছর এ দল ও দল করার পর হঠাৎ কেষ্টবিনোদ পড়ল "।

কেষ্টবিনোদের পতনে যাত্রা দলের সকলে আশ্চর্য হলেও আসল কারণ যে মায়া সেটা আর কেউ না বুঝুক বাপ্পা বোস ঠিকই বুঝেছিল। তাই

কেষ্টবিনোদকে তুলতে বাপ্পা ঝরিয়ার গাওনায় নিজেকে উঝাড় করে দেয় । কিন্তু মায়া রূপিণী বিনি তাঁর হারানো প্রিয়তমকে আর হারাতে চায়নি, সে নিজেই বলে,--"প্লে হয়ে যাক, তারপর হবে বোঝাপড়া । বুঝেছ ?" তাই নিয়ে উভয়ের মধ্যে গন্ডগোল । গাওনা শেষে কলকাতায় ফিরে গেলেও কেষ্টবিনোদ মায়াকে ধরে রাখতে পারেনি । তীব্র নির্যাতন ও প্রহার করে মায়াকে এবং অপেরা ভেঙে দিয়ে কাশী চলে যায় । আর মায়া ওরফে বিনি তাঁর প্রিয়তমের জন্য অপেক্ষায় থাকে ।.... হ্যাঁ শেষ পর্যন্ত বাপ্পা বোস ওরফে ইন্দুভূষণের সঙ্গে বিনির দেখা হয়, উভয়ে উভয়কে কাছে পায়, সার্থক হয় তাঁদের অভিনয়, পূর্ণ হয় "অভিনেত্রী" বাপ্পা বোসের জীবন।

তারাশঙ্করের "অভিনেত্রী" উপন্যাসটি বিশ্লেষণে স্বাভাবিকভাবেই আমরা দেখতে পাই, ইন্দুভূষণ ওরফে বাপ্পা বোস নারী চরিত্রে অভিনয়ের সৌজন্যে একজন কৃতি অভিনেত্রী হয়ে উঠেছেন। কিন্তু সমগ্র কাহিনীতে বাপ্পা বোস ছাড়াও আমরা আরও কিছু চরিত্রকে নারীর পার্ট করতে দেখেছি, যেমন- ভারতকুমার ঘোষাল । ভারতবাবু সুরঞ্জন চৌধুরীর সুরঞ্জন অপেরায় অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গেই নারী চরিত্রে অভিনয় করেছেন। কলকাতার এমেচার থিয়েটারে ফিমেল পার্ট খ্যাত সিধুবাবুও করেছেন নারীর পার্ট । পুরুষ হয়েও নারীর চরিত্রে অভিনয়ের সূত্রে "অভিনেত্রী" হয়ে ওঠার সুযোগ অনেকেরই ছিল । শেষ পর্যন্ত নানান বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে এক আদর্শ অভিনেত্রী হয়ে উঠেছেন ইন্দুভূষণ—বাপ্পা বোস। অথচ সামান্য গান গাওয়ার সৌজন্যে বিনি যে অসাধারণ অভিনয় করতে পারবে সে কথা বাপ্পা কখনোই ভাবতে পারেনি। ভাগ্য বিপর্যয়ের পর বৃহত্তর জীবনের হাতছানি বিনি উপেক্ষা করতে পারেনি। তাই ড্যান্স মাস্টার পেয়ারা মাস্টারের সঙ্গে পালিয়ে যাওয়ার মতো দুঃসাহস বিনি দেখাতে পারে । পরে বিনি নাম পরিবর্তন করে "মায়ারানী" নামে মায়াবতী অপেরায় অভিনয় শুরু করে। কেষ্টবিনোদ মায়াকে নিজে ভোগ করতে চেয়ে ব্যর্থ হয় । ঝরিয়ার বিখ্যাত যাত্রার আসরে বাপ্পাকে কাছে পাওয়ার সুযোগ কাজে লাগায় মায়া । কেষ্টবিনোদকে হারাতে মায়া জীবনের সেরা অভিনয় করে, তাঁর এমন অভিনয় দেখে স্বয়ং কেষ্টবিনোদ ধন্দে পড়ে যায়—"যেমন খুশী হচ্ছে তেমনি পার্ট করে যাচ্ছ—ভাবছো কি ?" এর উত্তরে মায়া যা বলেছিল,--"কি ভাববো । যেমন আসছে তেমনি করছি। তুমি এমন ষাঁড়ের মত চেঁচালে কেন ? এমন পাগলের মত হাসলে কেন?" শেষ পর্যন্ত বিনির জয় হয়েছিল "অভিনেত্রী" রূপেই, কিন্তু বাপ্পার জন্য হারাতে হয় অভিনয় জীবন।

বাপ্পা বোসের মুখ দিয়ে সমগ্র কাহিনী পাঠকের সামনে উপস্থাপন করলেও স্বয়ং লেখক তারাশঙ্কর নিজেই যে নাটকে অভিনয় করেছেন, এমনকি নারী চরিত্রে, সে কথাও জানা যায়। আসল কথা শুধু নাটক লেখা নয়, নাটকে অভিনয়ের ক্ষেত্রেও তাঁর উৎসাহ ছিল অসীম। তৎকালে পুরুষ শিল্পীরা মহিলা চরিত্রে অভিনয় করতেন, এটা খুব আশ্চর্যের ছিল না। তবে তারাশঙ্কর শুধু নারী চরিত্রেই নয়, 'কর্ণার্জুন', 'চিরকুমার সভা', 'বশীকরণ', 'বৈকুণ্ঠের খাতা' ইত্যাদি নাটকে পুরুষ চরিত্রে অভিনয় করেও প্রশংসা পেয়েছিলেন। 'আমার সাহিত্যজীবন' রচনায় তারাশঙ্কর লিখেছেন, 'আজ বলি আমার সাহিত্যিক জীবনে এই রঙ্গমঞ্চের সাহায্য পরিমাণে সামান্য হলেও দুঃসময়ের পাওনা হিসাবে অসামান্য। সেদিন রঙ্গমঞ্চের এই সাহায্য না পেলে সাধনার অকৃত্রিম নিষ্ঠা সত্ত্বেও আমার জীবনে এ সাফল্য অর্জন সম্ভবপর হত না।'

কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রে খ্যাতির চূড়ায় উঠলেও নাটককে সব সময় মনের কাছাকাছিই রেখেছিলেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। নাটকের প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা না থাকলে এমন উচ্চারণ অসম্ভব। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়কে অধিকাংশ বাঙালি ঔপন্যাসিক বলেই জানেন। 'কালো যদি মন্দ তবে কেশ পাকিলে কান্দ কেনে'-র মতো কয়েকটি গান লিখলেও মুখ্যত কথাসাহিত্যিক হিসেবেই তিনি বাঙালির কাছে পরিচিত। কিন্তু এই লেখক যে ছোটবেলায় নাট্যকার হতে চেয়েছিলেন, সে তথ্য অনেকের কাছেই তেমন পরিচিত নয়। নাটক লেখা দিয়েই সাহিত্যের জগতে পা রাখেন তারাশঙ্কর। 'ইতিহাস ও সাহিত্য' প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন, '...অভিনয় ভালো লাগে, নাটক রচনা করি। সে রচনা অবশ্য তখন solitary pride-এর সামিল আমার কাছে। মধ্যে মধ্যে জমজমাট নাট্যমঞ্চে অভিনয় করি.....।' +

তথ্যসূত্র

1. অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, কালের পুত্তলিকা, দেজ পাবলিশিং, ১৯৯৫।
2. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, আমার সাহিত্য জীবন, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০১১।
3. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প, যুগান্তর চক্রবর্তী সম্পাদিত, বেঙ্গল পাবলিশার্স।
4. নিতাই বসু, তারাশঙ্করের শিল্পিমানস, দেজ পাবলিশিং, ১৯৮৮।
5. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর রচনাবলী, মিত ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১৯৯৯।